জঙ্গিদের নিয়ে সরকারের লুকোচুরি খেলা

গোলাম মোর্তোজা ও অনিরুদ্ধ ইসলাম

একজন অপরাধী গ্রেপ্তারের পর জিজ্ঞাসাবাদে কিছু তথ্য প্রকাশ করবে। পুলিশ সেই তথ্যের সূত্র ধরে এগিয়ে যাবে। অপরাধী তার সহযোগী কোনো ব্যক্তির নাম বললে তাকেও গ্রেপ্তার করা হবে। অথবা তদন্ত করে দেখা হবে অপরাধী যার নাম বলছে সেই ব্যক্তি সত্যি সত্যি অপরাধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কি না। প্রচলিত ধারণায় এমনটাই হওয়ার কথা। সারা পৃথিবীতে এমনটাই হয়। বাংলাদেশেও যে এ রকম ঘটে না, সেটা বলা যাবে না।

কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের কিছু কিছু বিষয় ঠিক স্বাভাবিক নিয়মে ঘটছে না। কিছু বিষয়ে সরকারের আচরণ রীতিমতো রহস্যময়। কোনো এক অজানা ভয় যেন সরকারকে পেয়ে বসেছে। সেই ভয়ে সত্যটা উন্মোচন হোক- এটা তারা চায় না। যেন সত্য প্রকাশ পেলে মহাসর্বনাশ হয়ে যাবে। সরকারের আচরণে এটা না ভাবার আর কোনো কারণ নেই।

উদাহরণ দিয়ে বলা যায় বিষয়টি। চট্টগ্রামে র‍্যাবের হাতে গ্রেপ্তার হলো ভাগিনা রমজান। সে নিজেকে জামায়াত-শিবিরের সন্ত্রাসী হিসেবে স্বীকার করলো। ধর্মের কথা বলে জামায়াত তাকে সন্ত্রাসী বানিয়েছে বলল সে কথাও। আরো স্পষ্ট করে বলল চট্টগ্রামের জামায়াত সাংসদ শাহজাহান চৌধুরী, মতিউর রহমান নিজামী, গোলাম আযমরা তার হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছে, মানুষ খুন করিয়েছে...।

চট্টগ্রামের র‍্যাব অফিসে ধারণ করা এই সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছে সাপ্তাহিক ২০০০-এ। মুহম্মদ জাফর ইকবালসহ প্রগতিশীল ব্যক্তিরা এই সূত্র ধরে কলাম লিখেছেন। যদিও তাতে কোনো কাজ হয়নি। র‍্যাব ভাগিনা রমজানকে সসম্মানে পাঠিয়ে দিয়েছে কারাগারে। ভাগিনা রমজানের স্বীকারোক্তির সূত্র ধরে তদন্ত করে দেখেনি র‍্যাব। র‍্যাবের সন্দেহের তালিকায়ও আনা হয়নি শাহজাহান চৌধুরীদের। বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমান দেশব্যাপী প্রতিনিধি সম্মেলন করছেন। চট্টগ্রামের প্রতিনিধি সম্মেলনে তৃণমূল নেতারা প্রকাশ্যে অভিযোগ করে বলেছেন, জামায়াত এমপি শাহজাহান চৌধুরী একের পর এক বিএনপি নেতাদের হত্যা করছে...।

এ অভিযোগের ভিত্তিতেও কোনো তদন্তের উদ্যোগ নেয়া হয়নি। বগুড়া এবং নাটোরে ধরা পড়েছে কিছু জঙ্গি সন্ত্রাসী। তারা স্বীকার করছে জঙ্গি তৎপরতায় সম্পৃক্ত থাকার কথা। তারা স্পষ্ট করে বলেছে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের শিক্ষক ড. মুহম্মদ আসাদুল্লাহ আল গালিবের নাম। জঙ্গি সন্ত্রাসীরা বলছে, তাদের নেতা ড. গালিব। তার মতাদর্শে দীক্ষিত হয়েই তারা কাজ করছে। ড. গালিবের মতবাদ, জিহাদের মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে নিতে হবে। তার আগে সন্ত্রাস এবং সহিংসতার মাধ্যমে সমাজকে অস্থির করে তুলতে হবে। এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যাত্রা, মেলা, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড প্রভৃতি স্থানে গ্রেনেড বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হচ্ছে।

বহির্বিশ্বে এখন বাংলাদেশের পরিচিতি বোমা-গ্রেনেডের দেশ হিসেবে। এতোদিন পর্যন্ত বোমা-গ্রেনেড বিস্ফোরণের কোনো কূলকিনারা পাওয়া যাচ্ছিল না। বিএনপি, আওয়ামী লীগের ওপর আর আওয়ামী লীগ, বিএনপি-জামায়াতের ওপর দায় চাপাচ্ছিল। আওয়ামী লীগ নেতা শাহ এএমএস কিবরিয়াকে কে বা কারা হত্যা করেছে সেটা জানা না গেলেও সারা দেশে বোমা-গ্রেনেড আক্রমণের সঙ্গে কারা জড়িত সেই ক্লু পাওয়া গেছে।

কিছুসংখ্যক জঙ্গি সন্ত্রাসী ধরা পড়ার পর স্বীকার করছে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের কথা।

সরকারের কেমন যেন রাখ রাখ ঢাক ঢাক একটা আচরণ। কোনোভাবেই যেন সরকার চায় না সত্যটা প্রকাশিত হোক। না চাওয়ার পেছনে এমন কী কারণ আছে? সব কিছুকেই গোপন রাখা এবং ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা। একমাত্র যে অপরাধী সেই এমন আচরণ করতে পারে। সরকারের আচরণ অপরাধীর মতো কেন?

স্বাভাবিকভাবেই দেশবাসী আশা করেছিল এবার গ্রেনেড বোমার রহস্য আবিষ্কৃত হবে। সরকার এবার সত্যি সত্যি তৎপর হবে। কিন্তু পুরো জাতিকে বিস্মিত করে দিয়ে সরকার এখনো উল্টো দিকেই হাঁটছে। জঙ্গিরা যাদের নাম বলছে তাদের ধরার ব্যাপারে সামান্যতম আগ্রহও লক্ষ্য করা যাচ্ছে না সরকারের। ড. গালিবের বিরুদ্ধে এতো বড় অভিযোগ আসার পরও তিনি নিশ্চিন্তে অবস্থান করছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। সংবাদ সম্মেলন করে আত্মপক্ষ সমর্থন করছেন। আত্মপক্ষ সমর্থন তিনি করতেই পারেন। কিন্তু তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠার পর সরকার কোনো ব্যবস্থা নেবে না? তদন্ত করে পর্যন্ত দেখবে না- অভিযোগ সত্যি না মিথ্যা? তাহলে সরকার কেন বলে যে গ্রেনেড-বোমার বিস্ফোরণের সঙ্গে যারা জড়িত তাদের খুঁজে বের করা হবে? এফবিআই, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড বা ইন্টারপোল আনা হবে। কেন আনা হবে? অপরাধী শনাক্ত করার জন্য? যার বা যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে নতুন করে কী খুঁজে বের করতে চায় সরকার? মানুষের কাছে এই বিষয়গুলো পরিষ্কার নয়। জঙ্গি সন্ত্রাসীরা আজ যদি তাদের নেতা হিসেবে আওয়ামী লীগ বা বিরোধীদলের কোনো নেতার নাম বলতো, তাহলে কী সরকার এমন আচরণ করতো? তাকে কী গ্রেপ্তার বা জিজ্ঞাসাবাদ করা হতো না? একেক জনের জন্য একক রকম আইন করলে রহস্য উন্মোচন হবে কীভাবে। সরকারের কেমন যেন রাখ রাখ ঢাক ঢাক একটা আচরণ। কোনোভাবেই যেন সরকার চায় না সত্যটা প্রকাশিত হোক। না চাওয়ার পেছনে এমন কী কারণ আছে? সব কিছুকেই গোপন রাখা এবং ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা। একমাত্র যে অপরাধী সেই এমন আচরণ করতে পারে। সরকারের আচরণ অপরাধীর মতো কেন?

বগুড়ায় পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হলো বাংলাভাইয়ের জাগ্রত মুসলিম জনতার শফিকুল্লাহসহ তিন জঙ্গি সন্ত্রাসী। মামলা দায়ের হলো বগুড়ার গাবতলী থানায়। এখন সেই মামলার নথি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বাংলাভাইয়ের জঙ্গি স্কোয়াডের সদস্য শফিকউল্লাহ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি দিয়ে তার অপরাধের কথা স্বীকার করেছে। স্বীকার করেছে জাগ্রত মুসলিম জনতার কথা, বাংলাভাইয়ের কথা...। নথি খুঁজে না পাওয়ার পাশাপাশি জবানবন্দির কিছু অংশ সংশোধনের চেষ্টা চলছে। যদিও ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ১৬৪ ধারায় দেয়া জবানবন্দি সংশোধনের এখতিয়ার পুলিশের নেই। তারপরও পুলিশ এই চেষ্টা করছে? সরকারের গ্রিন সিগনাল না থাকলে পুলিশ এই চেষ্টা করতে পারে না। হারায় না, থানা থেকে মামলার নথিও।

সরকার মুখে বলছে বাংলাদেশে কোনো ইসলামী জঙ্গি সংগঠনের তৎপরতা নেই। আবার সরকারের পুলিশের হাতে ইসলামি জঙ্গি সংগঠনের নেতা ও ক্যাডার ধরা পড়ছে। সরকারের আচরণ হয়ে পড়ছে চরম স্ববিরোধী। জঙ্গি সন্ত্রাসীদের নিয়ে লুকোচুরি খেলছে। সরকারের আচরণ রীতিমতো অপরিপক্ক। সরকারের অপরিপক্ক রাজনীতির সুযোগে বিদেশী মিডিয়ার দৃষ্টি পড়েছে বাংলাদেশের ওপর। আর সরকারের শুধু 'না' 'না' ধ্বনি বিশ্বাস করছে না দেশ বিদেশের কেউই। বর্তমান বিএনপি সরকার ক্ষমতায় এসেছে দু'টি ইসলামী মৌলবাদী রাজনৈতিক দলকে সঙ্গে নিয়ে। এই দু'টি রাজনৈতিক দল যে সরকারের ওপর এতোটা প্রভাব বিস্তার করবে সেটা কেউই ধারণা করতে পারেনি। পল্টন ময়দানে জামায়াত নেতা দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর উপস্থিতিতে গজল গাওয়া হচ্ছে 'বাংলার আকাশে তালেবান পতাকা তুলবেই'। সাঈদী সরকারের শরিক দলের এমপি। সে কী এই বক্তব্য সমর্থন করে? সমর্থন করলে এটা তো তাহলে সরকারের বক্তব্য? কেউ যদি এভাবে ব্যাখ্যা করে তাহলে সেটা কী খুব অন্যায় হবে? কথায় কথায় সরকার দেশদ্রোহিতার কথা বলে। অনেক সাংবাদিক লেখক বুদ্ধিজীবীর নামে মামলা হয়েছে দেশদ্রোহিতার অভিযোগে। যদিও তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ বলতে তেমন কিছু ছিল না। যারা বাংলার আকাশে তালেবান পতাকা তুলতে চায় তাদের বিরুদ্ধে কী দেশদ্রোহিতার অভিযোগ আনা যায় না? যদি না যায় তাহলে দেশদ্রোহিতার সংজ্ঞা কী?

কথায় কথায় সরকার দেশদ্রোহিতার কথা বলে। অনেক সাংবাদিক লেখক বুদ্ধিজীবীর নামে মামলা হয়েছে দেশদ্রোহিতার অভিযোগে। যদিও তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ বলতে তেমন কিছু ছিল না। যারা বাংলার আকাশে তালেবান পতাকা তুলতে চায় তাদের বিরুদ্ধে কী দেশদ্রোহিতার অভিযোগ আনা যায় না? যদি না যায় তাহলে দেশদ্রোহিতার সংজ্ঞা কী?

ক্ষমতার অংশীদার দু'টি মৌলবাদী দলের তুলনায় বিএনপি অনেক বড় এবং শক্তিশালী রাজনৈতিক দল। এই দলটির বেশিরভাগ নেতা মুক্তিযোদ্ধা। দলটির ভেতরে প্রকাশ্যে এবং গোপনে চরম প্রতিক্রিয়াশীল মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তি রয়ে গেছে। অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে তারা এখন বেশি সক্রিয়। দলে প্রভাব তাদেরই বেশি। সরকারি সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেও যার প্রভাব পড়ছে। প্রকাশ্যে বিএনপি হলেও গোপনে স্বার্থ দেখছে জামায়াতের। ফলে সারা দেশে একের পর এক প্রগতিশীল কর্মকান্ড বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে। যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি। টিএসসি ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী তথা সংস্কৃতি কর্মীদের মিলন ক্ষেত্র। গান, নাটক, আবৃত্তি, আড্ডায় জমজমাট থাকতো পুরো টিএসসি এলাকা। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর হঠাৎ করেই থামিয়ে দেয়া হলো টিএসসির কর্মকান্ড। টিএসসি এখন মৃত ভবন। বিষয়টি নিয়ে কারো মধ্যেই তেমন কোনো উচ্চবাচ্য লক্ষ্য করা গেল না। সবাই যেন স্বাভাবিকভাবে মেনে নিল।

শহীদ মিনারে মাসব্যাপী অনুষ্ঠান আমাদের সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। হঠাৎ করেই এ বছর সেটা বন্ধ করে দেয়া হলো। বিজ্ঞ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যুক্তি দেখালেন, শহীদ মিনার ধোয়া-মোছার কাজ করতে হবে- তাই ২০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠান করা যাবে না। কী অদ্ভুত যুক্তি? ধোয়া-মোছার জন্যে আপনারা এতদিন কোথায় ছিলেন? জানুয়ারি মাসে করেননি কেন?

কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে একুশের অনুষ্ঠান করতে দেয়া হবে না। কারণ নিরাপত্তা। গ্রেনেড-বোমা ফাটতে পারে। কার আছে এই যুক্তি খন্ডানোর সাধ্য?

গত বছর বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে আক্রান্ত হয়েছিলেন হুমায়ুন আজাদ। এবার টিএসসি প্রাঙ্গনে বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হলো। আক্রান্ত হচ্ছে ব্র্যাক-গ্রামীণ ব্যাংক অফিস।

এসব কী বিচ্ছিন্ন ঘটনা? না একটির সঙ্গে আরেকটি সম্পর্কযুক্ত?

গত কয়েক বছরের ঘটনা বিশ্লেষণ

করলে দেখা যায় আসলে কোনোটিই বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। সবগুলো ঘটনাই একটি পরিকল্পনার অংশ। জামায়াত ক্রমশ গ্রাস করে ফেলছে বিএনপিকে। যা কিছু প্রগতির পক্ষে সব কিছুকেই ধ্বংস করে দিচ্ছে তারা। কৌশলে এই কাজটি বিএনপিকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছে জামায়াত। বামধারার প্রগতিশীল রাজনীতি আজ বিলুপ্তপ্রায়। যা কিছু ছিল সেটাকেও নিঃশেষ করে দিচ্ছে বাংলা ভাইরা। প্রগতিশীল সুশীল সমাজের একটি অংশ ব্যস্ত দলীয় প্রচার প্রোপাগান্ডা নিয়ে। অন্য অংশটি নিশ্চুপ, দর্শক। তাদের যেন কিছু বলার নেই, করারও নেই। তারা যেন অথর্ব, জড় পদার্থ।

শাহ এএমএস কিবরিয়ার জন্যে হেলিকপ্টার পাওয়া যায় না। দেলোয়ার হোসেন সাঈদী শিবির নেতাদের নিয়ে সরকারি হেলিকপ্টারে করে মিটিং করেন সন্দ্বীপ এবং চট্টগ্রামে। শিবির সভাপতি সরকারি হেলিকপ্টার নিয়ে চলে আসেন ঢাকায়! এসবই দেশের মানুষ দেখছে। করছে না কিছুই। হয়তো তাদের কিছু করার নেই। করার যাদের ছিল তারা ব্যস্ত ক্ষমতায় যাওয়ার রাজনীতি নিয়ে। বলা যায়, তারা এখন উদ্দেশ্যহীন, দিকভ্রান্ত।

আতঙ্ককে সঙ্গী করে বসবাস করছে দেশের মানুষ। এ বছর অন্তত বইমেলা হয়েছে। আগামী বছর হবে কি না আমরা জানি না। হয়তো বলা হবে নিরাপত্তার কারণে মেলা করা ঠিক হবে না। আমরা হয়তো এটাই মেনে নেব।

বান্দরবান অঞ্চলে প্রায় প্রতিদিন ভারী অস্ত্র ধরা পড়ছে। এই অস্ত্রগুলো কাদের সেটা প্রকাশ করছে না সরকার। মিয়ানমারের বিদ্রোহী এবং রোহিঙ্গারা যে এই অস্ত্র নেটওয়ার্কের সঙ্গে জড়িত, জেনেও সেটা না জানার ভান করছে সরকার। জামায়াতসহ দেশের মৌলবাদী রাজনৈতিক দলগুলোর একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে এই অস্ত্র ব্যবসায়ীদের সঙ্গে। বিদেশের মিডিয়া অস্ত্র ব্যবসার সঙ্গে বাংলাদেশের কোনো কোনো গোষ্ঠীর জড়িত থাকার বিষয়টি প্রকাশ করছে মাঝে মধ্যেই। চট্টগ্রামের দশ ট্রাক অস্ত্রের ঘটনা সরকার তদন্ত না করেই ধামাচাপা দিয়ে দিল।

দক্ষিণ এশিয়ার সর্ববৃহৎ বেআইনি অস্ত্রের চালান দক্ষিণ এশিয়া ও পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর নিরাপত্তা এবং গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। যদিও বাংলাদেশ সরকার ও তার গোয়েন্দা সংস্থাগুলো শুরু থেকেই এ ব্যাপারে এক ধরনর নিরুত্তাপ মনোভাব প্রদর্শন করে। বিদেশ থেকে আসা এতো বড় একটি অস্ত্র চালানের সঙ্গে আন্তর্জাতিক কোনো মহলের জড়িত থাকার বিষয়টি প্রায় সবার কাছেই স্পষ্ট ছিল। সরকারের নেতৃস্থানীয় কর্তাব্যক্তিদের বিষয়টি তদন্তের ব্যাপারে কোনো আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়নি। এ ব্যাপারে ইন্টারপোলসহ পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর গোয়েন্দা সংস্থার সহযোগিতা গ্রহণ করা দূরে থাক, বিদেশী পত্রপত্রিকায় এ অস্ত্র চোরাচালানের ব্যাপারে যেসব তথ্য প্রকাশিত হয়েছে তার কিছুই তারা আমলে নেয়নি, নিতে চায়নি। সরকারের পক্ষ থেকে পুরো বিষয়টি প্রথম থেকেই গোপন করার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গেছে। অস্ত্র চোরাচালানের তদন্তকারী নিয়োগ ও বদল, মামলার চার্জশিট প্রদান, গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিদের পরিচয়ে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সর্বশেষ খবর অনুযায়ী চট্টগ্রামের অস্ত্র চোরাচালানের ঐ মামলার দ্বিতীয় দফায় চার্জশিট দেয়া হয়েছে এবং অস্ত্র আইনের সাধারণ ধারায় মামলার বিচার হবে। খুব স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ অস্ত্র মামলার মতো কিছু ব্যক্তির জেল-জরিমানার মধ্য দিয়ে এই অস্ত্র চোরাচালান ঘটনার ইতি ঘটবে। সরকারের পক্ষ থেকে দাবি করা হবে যে, তারা এ ব্যাপারে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। কিন্তু এর সঙ্গে পুলিশ-বিডিআর-নেভি-আর্মির কোনো সম্পর্ক ছিল কি না, রোহিঙ্গা এবং চট্টগ্রামের মাদ্রাসাগুলো এর সঙ্গে জড়িত কি না- কোনো বিষয়েই সরকার তদন্ত করার প্রয়োজন মনে করলো না।

অস্ত্র ব্যবসা ও নিরাপত্তাবিষয়ক বিশেষজ্ঞ মার্কিন পত্রিকা 'জেনস ইন্টিলিজেন্স রিভিউ' গত বছর ১ অক্টোবরের প্রতিবেদনে লিখেছে, এই অস্ত্র চালান সাফল্যজনকভাবে তার গন্তব্যে পৌঁছতে পারলে ভারতে উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলোর সশস্ত্র বিদ্রোহী তৎপরতা এক বিপজ্জনক রূপ নিত। বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তায়ও এর বিরূপ প্রভাব পড়তো।

'জেনস ইন্টিলিজেন্স রিভিউ'-র প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রথমে এটা সাধারণভাবে ধারণা করা হয়েছিল যে, দক্ষিণ-পশ্চিম চীন থেকে সড়কপথে মিয়ানমারের আরাকান উপকূলে সিতু বন্দর দিয়ে অস্ত্র চোরাচালানটি নিয়ে যাওয়া হয়। পরে অবশ্য এটা জানা গেছে, হংকং থেকে সিঙ্গাপুর হয়ে মালাক্কা প্রণালী দিয়ে বঙ্গোপসাগরে দুটি ট্রলারের মাধ্যমে চট্টগ্রাম বন্দরে ওই অস্ত্রের চালান আনা হয়।

'জেনস ইন্টিলিজেন্স রিভিউ'র সূত্র অনুসারে, আসামের উলফা (ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অব আসাম) ও এনএসসিএন-আইএমের (ন্যাশনালল সোস্যালিস্ট কাউন্সিল অব নাগাল্যান্ড ইসাক মুইভাহ ফ্যাকশনের জন্য এই অস্ত্রের চালান যাচ্ছিল।

চট্টগ্রামের জেটিতে ওই অস্ত্র খালাসের সময় 'উলফা' নেতা পরেশ বড়ুয়া এবং এনএসসিএনের অস্ত্র সংগ্রহকারী অ্যান্থনি সিমারি সেখানে উপস্থিত ছিল। 'জেনস ইন্টিলিজেন্স রিভিউর মতে, ভারতে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করার কাজে নিয়োজিত একটি বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থা এ অস্ত্র চোরাচালানের অর্থ জুগিয়েছে।

'জেনস ইন্টিলিজেন্স রিভিউ'র প্রতিবেদন খুব স্বাভাবিকভাবেই এই অস্ত্র চোরাচালানের সঙ্গে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে উত্তর-পূর্ব ভারতের ওই সব বিদ্রোহী সংস্থার ওই অস্ত্র সংগ্রহের অর্থ যোগানদাতা ভিনদেশী গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যেকোনো মহলের সম্পর্কের বিষয়টি তুলে ধরে। কারণ বাংলাদেশের সে ধরনের কোনো সম্পর্ক বা ব্যবস্থা ছাড়া দশ ট্রাক অস্ত্র এভাবে দেশের মধ্য দিয়ে পরিবহন হতে পারতো না। আরো একটি বিষয় এখানে স্পষ্ট যে, এপ্রিলের এই অস্ত্র চোরাচালান নতুন কোনো ঘটনা নয়। এর আগেও নিশ্চিতভাবে এ ধরনের অস্ত্র চোরাচালান হয়েছে। তা না হলে একটি নতুন পথে এতো টাকার এতো পরিমাণ অস্ত্র চোলাচালানের ঝুঁকি এর সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা নিত না।

শহীদ মিনারে মাসব্যাপী অনুষ্ঠান আমাদের সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। হঠাৎ করেই এ বছর সেটা বন্ধ করে দেয়া হলো। বিজ্ঞ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যুক্তি দেখালেন, শহীদ মিনার ধোয়া-মোছার কাজ করতে হবে- তাই ২০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠান করা যাবে না। কী অদ্ভুত যুক্তি? ধোয়া-মোছার জন্যে আপনারা এতদিন কোথায় ছিলেন? জানুয়ারি মাসে করেননি কেন?

সরকারের পক্ষ থেকে ভাঙা রেকর্ড বারবার বাজানো হচ্ছে যে, দেশের এবং বিদেশের কিছু মিডিয়া বাংলাদেশ বিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। এই একই কথা শুনতে শুনতে দেশের মানুষ ক্লান্ত। কিন্তু বিদেশের পত্রিকায় যদি দেশের স্বার্থ বিরোধী কোনো সংবাদ প্রকাশিত হয়, তাহলে সরকারের কি কিছু করণীয় নেই? শুধু অস্বীকার করলেই কী সমস্যার সমাধান হয়ে যায়? বিষয়টি তদন্ত করে তো দেখা প্রয়োজন।

কিন্তু চট্টগ্রামের এই অস্ত্র চোরাচালান সংক্রান্ত তদন্তে এসব তথ্য সামান্য যাচাই করেও দেখা হয়নি। প্রথম থেকেই এতো বড় একটি অস্ত্র চোরাচালানের তদন্তের দায়িত্ব কর্ণফুলী থানার ওসির ওপর দেয়া হয়। অভিযোগ ছিল যে ঐ ওসি উপরের নির্দেশে জেটিতে খালাসরত অবস্থায় ঐ অস্ত্র চোরাচালান আটক করলেও, এর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের পালিয়ে যাবার সুযোগ করে দেয়। জেনস ইন্টিলিজেন্স রিভিউয়ের অনুসন্ধান অনুযায়ী দশ ট্রাক অস্ত্রের মধ্যে এক ট্রাক অস্ত্রের হদিস পাওয়া যায়নি।

ধারণা করা হয় এই 'হাওয়া' হয়ে যাওয়া ট্রাকের মধ্যে ছিল গ্রেনেড এবং ৫০ কোটি টাকা। ড. কামাল হোসেন বিষয়টি নিয়ে ইদানীং কথা বলছেন। কিন্তু তিনিও খুব পরিষ্কার করে কিছু বলছেন না। যদি তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ কোনো তথ্য থাকে তিনি কেন প্রকাশ করছেন না? এত বড় স্পর্শকতার একটি বিষয় নিয়ে রাজনৈতিক বক্তব্য দেয়ার তো কোনো অর্থ হয় না।

বাংলাদেশে একের পর এক যে গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটছে এগুলো কী ওই ট্রাকের গ্রেনেড? এই প্রশ্নের জববার দেয়ার একমাত্র দায়িত্ব সরকারের। জনগণকে সবকিছু না জানিয়েছে নির্বিকার থাকার আর 'বিরোধী দল' করেছে জিকির তোলার অবসান হবে কবে? কথা উঠেছে এক ট্রাক গ্রেনেড এবং অস্ত্র জঙ্গি মৌলবাদীদের হাতে এসেছে। অভিযোগটি যদি সত্যি হয় তবে দেশের জন্য এটা কতটা ভয়ঙ্কর সংবাদ? বিএনপি কী এটা বুঝতে পারছে?

সরকার যদি না চায় তাহরে তদন্তকারী ওসি কী ঘটনাস্থলের মানচিত্র ও নকশাও ভুলভাবে উপস্থাপন করতে পারেন। পরবর্তীতে তাকে পাল্টিয়ে একজন এ এএসপিকে ঐ মামলার তদন্তের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। তিনি পূর্বোক্ত তদন্তকারীর দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে চার্জশিট কোর্টে দাখিল করলে কোর্ট সেই চার্জশিট গ্রহণ করতে রাজি হয় না এবং তদন্তকারী ঐ ওসির বিরুদ্ধে সাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার কথা বলে। কোর্ট সম্পূরক চার্জশিট দেয়ার কথা বললে অপর এক তদন্তকারী পুনরায় কিছু তদন্ত করে একটি সম্পূরক চার্জশিট দিয়েছে। কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই এই অস্ত্র চোরাচালানের সঙ্গে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার জড়িত থাকা এবং তারা কোথায় কিভাবে এ অস্ত্র সংগ্রহ করেছে, কোনপথে তা নিয়ে এসেছে, কোথায় তার গন্তব্যস্থান ছিল তার কিছুই ভুলেও উল্লেখ করা হয়নি। দেশীয় মৌলবাদী জঙ্গিদের বিষয়টি তো তদন্তের আওতায়ই আনা হয়নি। ঐ মামলায় যাদের আসামি করা হয়েছে তারা হচ্ছে ঐ ট্রলার দু'টির মালিক ট্রাক মালিক বন্দোবস্তকারী এবং মালামাল বহনকারী শ্রমিক। এরা যে ঐ অস্ত্রচোরাচালানে ব্যবহৃত সামান্য ঘুটি মাত্র সেটা বোঝা কারো পক্ষে অসম্ভব নয়। কিন্তু সরকার ও পুলিশের তদন্তের মনোযোগ সেখানেই দেয়া হয়েছে। মূল বিষয়কে আড়াল করার জন্য এবং এর সঙ্গে দেশের অভ্যন্তরে জড়িত রুই কাতলাদের রক্ষা করার জন্যই যে তদন্তে এ হাল করা হয়েছে সেটাও স্পষ্ট। তা না হলে এই অস্ত্র চেরাচালানের আন্তর্জাতিক সম্পর্কটি বাদ দিয়ে দেশের অভ্যন্তরে কারা জড়িত সে বিষয়গুলোও দেখা যেত। দেশের পত্র-পত্রিকায় এই অস্ত্র চোরাচালানে বহনকারী জাহাজ হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরীর কিউ.সি. শিপিংয়ের নাম এসেছে। ঐ কিউ.সি. শিপিংয়ের জাহাজ সেদিন চট্টগ্রাম বন্দরের বর্হিনোঙ্গরে কোথায় অবস্থান করছিল এবং কি তৎপরতায় লিপ্ত ছিল তার সন্ধান করলেই এ অস্ত্র চোরাচালানের দেশের অভ্যন্তরের কানেকশনটি খুব সহজেই বের করা যেত।

যদি সাকা চৌধুরীর জাহাজের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ সত্যি না হয়ে থাকে সেটাও তদন্ত করে প্রকাশ করা প্রয়োজন ছিল। প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টার নামে এমন গুরুতর অভিযোগ উঠবে আর সরকার চুপচাপ থাকবে, এটা তো কোনো কথা হতে পারে না। নিরব থাকাটা তো মানুষ সম্মতির লক্ষণ বলেই মনে করে।

> **শাহ এএমএস কিবরিয়ার জন্যে হেলিকপ্টার পাওয়া যায় না। দেলোয়ার হোসেন সাঈদী শিবির নেতাদের নিয়ে সরকারি হেলিকপ্টারে করে মিটিং করেন সন্দ্বীপ এবং চট্টগ্রামে। শিবির সভাপতি সরকারি হেলিকপ্টার নিয়ে চলে আসেন ঢাকায়! এসবই দেশের মানুষ দেখছে। করছে না কিছুই। হয়তো তাদের কিছু করার নেই। করার যাদের ছিল তারা ব্যস্ত ক্ষমতায় যাওয়ার রাজনীতি নিয়ে। বলা যায়, তারা এখন উদ্দেশ্যহীন, দিকভ্রান্ত।**

চট্টগ্রামে দক্ষিণ এশিয়ার সর্ববৃহৎ এই অস্ত্র চোরাচালানের ব্যাপারে বেগম খালেদা জিয়ার জোট সরকার একটা রহস্যের পর্দা দিয়ে রেখেছেন। ঐ ঘটনার তথ্য যে প্রধানমন্ত্রী অথবা সরকারের অজানা তা মোটেও নয়। কিন্তু তারা এ ব্যাপারে কিছু করতে চাচ্ছেন না। এতে জোট সরকারের রাজনীতির কোনো সুবিধা হতে পারে, কিন্তু বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা চরম বিপদের মুখে পড়েছে। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত বরাবরই অভিযোগ করে আসছে যে ভারতের উত্তর-পূর্ব রাজ্যের বিদ্রোহী তৎপরতায় বাংলাদেশ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করছে। বাংলাদেশ সরকার এ অভিযোগ অস্বীকার করলেও, এই অস্ত্র চোরাচালানের ব্যাপারে তাদের শীতল মনোভাব, অভিযোগকে ভিত্তি প্রদান করেছে।

ছোট বড় সব প্রতিষ্ঠানেই এখন আতঙ্ক চলছে। কখন গ্রেনেড বোমার বিস্ফোরণ ঘটে। শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়-গুলোতেও চলছে আতঙ্ক। মানুষ সরকারের পেটে চিমটি দেয়ার চেষ্টা করছে। মাঝে মাঝে চিমটি দিচ্ছেও। একটি বিশেষ প্রাণীকে চিমটি দেয়ার সাতদিন পরে সে বুঝতে পারে। সরকারের তো প্রায় চার বছর পূর্ণ হয়ে গেল, তাও বুঝতে পারছে না। কবে যে সে বুঝতে পারবে!

• • •

ফেব্রুয়ারি মহান ভাষা আন্দোলনের মাস। এ মাসে আমরা শুধু শোক নয় বিজয়ের কথা বলতে চাই। '৫২তে রক্ত দিয়ে আমরা বিজয়ী হয়েছিলাম। বিজয়ী হয়েছিলাম '৭১-এও। পরাজিত নরপিচাশদের এ মাসে আমরা প্রচ্ছদে আনতে চাই না। কিন্তু না চাইলেও বারবার তাদের আনতে হয়।